অনন্য এক মায়ের কথা - ২

খন্দকার জাহিদ হাসান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

(৮)

মায়ের সংগীত-প্রীতি ছিলো গগনচুম্বী। সেই প্রীতি আমাদের পরিবারের সবার মধ্যেই সঞ্চারিত হোয়েছিলো। বাসার কাজের মেয়েও বাদ ছিলো না। অনেক সময় তারাও মাকে স্মরণ করিয়ে দিতো, ''খালা, কোলকাতার রেডিওতে আজ অনুরোধের আসর রয়েছে কিন্তু!''
পেশাগত জীবনেও তিনি যে-টুকু সময় বাসাতে থাকতেন, তার বেশীরভাগ-ই তাঁর কাটতো গান শুনে। ঘরকন্নার কাজ করতে করতে, খেতে খেতে, এমনকি কবিতা বা গল্প লিখতে লিখতেও গান শোনা চলতো তাঁর।

চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্তির পর সাহিত্য-চর্চা ও গান-ই তাঁকে মানসিকভাবে উৎফুল্ল রেখেছিলো। ধর্মের দিকেও বেশ ঝুঁকে পড়েছিলেন। সন্তানেরা তো আর কেউ কাছে নেই, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। অত্যাধুনিক বিশ্বের অত্যাধুনিক সব মানুষ তারা! মা-বাবা আর আত্মীয়-পরিজনদেরকে দেবার মত অতো সময় কোথায় তাদের হাতে!!

বেশ টের পেতাম, মা আমার যেন দু'চোখ দিয়ে কথা বলছেন। মুখ দিয়ে কথা বলার একটা অসুবিধাজনক দিক রয়েছে। কারণ মানুষের মুখ মাত্র একটি, অথচ চোখ-কান দু'টি ক'রে। এক চোখে মা বলতেন, ''বাছারা, মায়ের আঁচল ধরে পড়ে থাকার কোনো দরকার নেই তোদের। আমি তো আর তেমন অবুঝ মা নই। সব-ই বুঝি। চলে যা ব-হু-দূ-রে....., যেখানে তোদের মন চায়। দেখছিস্ না, চারিদিক কেমন পাল্টে যাচ্ছে? জানিস্-ই তো, উদ্ভট এক উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ! এখানে স্বস্তিতে মরারও কোনো গ্যারান্টি নেই! বাইরে চলে যা। গোটা পৃথিবীটাকেই মনে মনে তোদের স্বদেশ ভেবে নে, দেখিস্ শান্তি পাবি।'', ইত্যাদি।

আবার অন্য চোখে মা যেন নীরবে বলতেন, ''বাবারা, তোরা সবাই তা হলে চলেই গেলি এভাবে চিরতরে আমার বুকটা খালি ক'রে?.....এসে একবার দেখে যা, আজও আমাদের গোলাপ-ঝাড়ে গোলাপ ফোটে, হাস্নুহেনা গন্ধ ছড়ায়, কাঠ-করবীর দারুণ শোভা এখনও তো চোখ দু'টিকে ধন্য করে! প্রতি হপ্তায় পুকুর থেকে কেমন তাজা আর সুস্বাদু সব মাছ ধরা হয়, তোদের ছেড়ে যে মুখে আমার রোচে না সে সব! পদ্মাপাড়ের বালিয়াড়ি চর আজও কেমন খাঁ খাঁ করে। ঝিলের বুকে শাপলা-শালুক তুলছে মেয়ের দল। মাঝি আমায় ডেকে বলে, 'মা রে, তুমার ছাওয়ালেরা কবে বিদ্যাশ থ্যাক্যা আসিচ্চে?'....তোরা দেখে যা, এখনও বাংলা-মায়ের অভাগা সব সন্তানেরা দু'মুঠ খেয়ে কেমন বেঁচে-বর্তে আছে!....জানি আমি, উদ্ভট সেই উঠের পিঠে চলেছে স্বদেশ আজও। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীটাই উদ্ভট এক ডাইনোসরের পিঠে চেপে বসতে যাচ্ছে.....।''

(৯)

প্রত্যেক মা-ই মনে করেনঃ তাঁর সন্তানেরা খুব বোকা, কখোন যে কোন্ বখাটে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যায় তারা! ছেলের লেখাপড়া শেষ হওয়ার পরে চাকুরী জুটলেও মা-বাবার ভয় যেন তবু কাটতে চায় নাঃ কোন্ চন্ডীরাণীর আঁচলে বাঁধা পড়ে যে তাঁদের সহজ-সরল ছেলেটির জীবন নষ্ট হয়, তা কে জানে! সাবালক সন্তানদের নিয়ে মা-বাবাদের এ ধরণের দুশ্চিন্তাটা বেশ অমূলক হলেও স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। আমার মা-বাবার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তাই 'ছেলের বৌ' নির্বাচনের ব্যাপারটা মা নিজের হাতেই রাখার চেষ্টা করতেন, এক্ষেত্রে আমাদের ওপর ভরসা রাখার সাহস পেতেন না। আমারটার খোঁজও তিনিই জুটিয়ে ফেলেছিলেন।

বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ রাজশাহী শাখার সাথে দীর্ঘকাল ধরে জড়িত ছিলেন মা। সেই সূত্রে 'এক-ই নৌকার যাত্রী' এক তরুণীকে ভালো লেগে গেল তাঁর। এক মঞ্চ নাটকের জের ধরে স্নেহের সেই সম্পর্কটি গাঢ়তর হলো। পরে তাকেই মা পুত্রবধূ ক'রে ঘরে তুললেন। একেই তাঁর কোনো কন্যাসন্তান ছিলো না। তার উপর আবার বড়ো ছেলের বৌ। আমার অবর্তমানে সামান্য সুযোগ পেলেই তিনি ছেলের বৌকে নিজহাতে সাজিয়ে-গুজিয়ে বেড়াতে বের হতেন। আবার তার নামটি রেখেছিলেনঃ 'অন্তরা'। মা আমার গান-পাগল মানুষ ছিলেন কিনা! এই দু'নারীর চলা-ফেরা দেখে অনেক সময় নতুন লোকেরা কিংবা মনভোলা মানুষেরা 'অন্তরা'-কে মায়ের নিজের মেয়ে বলেই ভুল করতেন।

(১০)

অনেক অনেকদিন আগে থেকেই আমরা দেখে আসছিলাম যে, মায়ের উচ্চ রক্তচাপ। মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর সময় থেকেই। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গ্রাম থেকে আমরা খবর পেলাম, আমাদের শহরের বাসাটা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। অপরাধঃ ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেল্সের কতিপয় সদস্যকে আমার বাবা সেই বাসাতে থাকতে দিয়েছিলেন এবং তারা বাসাটাকে আখড়া বানিয়েছিলো। গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর আমাদেরকে ফের নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে হলো। কারণ এক পোড়া-বাড়ী ছাড়া আমাদের জন্য তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। সেই দুঃসময়ে মা-বাবার বিষণ্ন মুখের পানে তাকানো যেতো না। মাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, ''আমার খুব খারাপ লাগছে, একটু শুয়ে থাকি।''

আসলে তখনকার সেই অল্প বয়স থেকেই মা'র রক্তচাপজনিত অসুখের শুরু। মুক্তিযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। এর-ই মধ্যে বিপদের উপর আরেক বিপদ নেমে এলো আমাদের জীবনে। পাক-বাহিনীর হায়েনারা বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। সেদিন ছিলো ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখ। মায়ের সেদিনকার সেই অসহায় মুখ ও বিপর্যস্ত চেহারার কথা কোনোদিনও ভোলা যায় না। (কাকতালীয়ভাবে সেই দিনটি থেকে ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর পরে ২০০৬ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে আমাদের মায়ের মৃত্যু হয়।)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভীষিকাময় জোহা হলে একটি মাস নির্যাতনভোগের পর বিজয় দিবসে বাবা মুক্তি পেলেন। অতঃপর আমাদের পারিবারিক চৌহদ্দিতে সংগ্রাম-মুখর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। কিন্তু 'সার্বক্ষণিক অনিশ্চয়তাবোধ' থেকে মায়ের আর মুক্তিলাভ ঘটলো না। সেই থেকে যে-কোনো সাধারণ সমস্যাকে ইস্যু ক'রে দুশ্চিন্তা করাটাই তাঁর মজ্জাগত হোয়ে গেল। আরও পরে তাঁর ডায়াবেটিস্ও ধরা পড়লো। চার সন্তানের মধ্যে তিনটিই দেশের বাইরে চলে যাওয়ার পর থেকে মায়ের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করলো। শরীরের আর দোষ কি? তার

অবস্থা তো মনের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল! ভালো থাকার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর আর সফল হলো না।..... আসলে ত্বরান্বিত হওয়াই তো যে-কোনো পতনের ধর্ম! মানুষের সাধ্য কি রোখে তা??

(১১)

বেশ ক'বছর আগে কোলকাতা সাহিত্য পরিষদ থেকে মা সাহিত্য পুরষ্কার পেয়েছিলেন, যা তাঁকে বেশ উজ্জীবিত করেছিলো। নিয়তির চক্রান্তে তবু তাঁর দ্বিতীয় স্ট্রোক্ হলো ২০০৪ সালের গোড়ার দিকে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় আমাদের পরিবারের সকলের কেটে গেল অনেকটা সময়।

২০০৬ সালের আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে বাংলাদেশে ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলোঃ আমার জন্মদিনে মা'র সাথে একটু কথা বলি। কে যে ফোন ধরেছিলো, এখন আর ঠিক মনে নেই তা। বললো, ''উনি তো তাঁর নতুন বইয়ের প্রকাশনা উৎসব নিয়ে একটু ব্যস্ত আছেন । আপনি আবার না হয় পরে ফোন করুন।'' আমি মাইকে মায়ের গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাদের উঠোনেই আসর বসেছে। সাহিত্যাংগনের বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিও নাকি পদধূলি দিয়েছিলেন সেদিন আমাদের বাসাতে।

দ্বিতীয়বার স্ট্রোকের পর মা বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। তাই বাড়ীর প্রাংগণে মায়ের নতুন বইয়ের প্রকাশনার সেই উৎসবের ব্যাপারটা আমার কাছে প্রথমে একটু অস্বাভাবিক-ই ঠেকেছিলো। পরক্ষণেই আনন্দিত হলাম, ''এই তো মা একটু একটু ক'রে উঠে দাঁড়াচ্ছেন তাহলে!'' তবু আমার অবচেতন মনটা কেন যেন কেঁদে উঠলোঃ নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের শেষবার জ্বলে ওঠা নয় তো এটা? বলাই বাহুল্য যে, অবচেতন মনের আশংকা মিথ্যা ছিলো না।

(১২)

২০০৬ সালের শেষের দিকে আমার সবচেয়ে ছোটোভাই সুজন অস্থির হোয়ে পড়লো। অস্ট্রেলিয়াতে পদার্পণের দু'বছর পূর্ণ না হতেই সে বলে উঠলো, ''না বড়োভাই, মা'র শরীরটা মনে হয় ভালো যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে দু'বার স্ট্রোক হোয়েছে। কখোন কি ঘটে যায়, তা বলা যায় না। আমি না হয় সবাইকে নিয়ে একবার বাংলাদেশ থেকে ঘুরেই আসি।'' আমি উত্তর করলাম, ''মা তো আস্তে আস্তে সেরেই উঠছেন। তোমাদের অস্ট্রেলিয়ায় থাকার দু'বছরটা পূর্ণ ক'রে গেলে ভালো হতো না?'' সুজনের জবাব, ''না, আমরা বরং যাই। দু'টো মাস না হয় কাটিয়েই আসি মা'র সংগে। তোমরা আসো সামনের বছরের শুরুতে।''

নভেম্বরের মাঝামাঝি সুজন ঢাকাতে গিয়ে সপরিবারে আট্‌কা পড়লো। সেই চিরাচরিত আর একঘেঁয়ে অবরোধ ও ধর্মঘট। কোথাও নড়াচড়া করা যাবে না। কি সৃষ্টিছাড়া সব কথাবার্তা! সাত-সমুদ্র-তের-নদী পার হওয়ার পর ওকে শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পড়তে হলো আপন জন্মভূমির মাটিতে।

সাঁঝের বেলা দূরালাপনীতে সুজনের কথা হলো মা'র সংগেঃ ''মা, আগামীকাল অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে। দেখা হচ্ছে তা হলে। দোয়া রেখেন মা।''
''কাল যে তোরা আসছিস্, তা আমি জানতাম বাবা। তাই পুকুর-থেকে-ধরা মাছ রাঁধা হোয়েছে তোদের জন্য। তাড়াহুড়ো করিস্ না, সবাইকে নিয়ে ধীরে-সুস্থে আয়....।'' সুজনের একটু খট্‌কা লাগলো। মায়ের কণ্ঠঃস্বর এত নিরুত্তাপ কেন! সবকিছু ঠিকঠাক

রয়েছে তো? দু'দিনের অপেক্ষাতেই মা এতটা হাঁপিয়ে উঠলেন? আবার মা সুজনের গলা শুনতে পেলেন, ''কি ব্যাপার মা, আপনার শরীর ভালো তো?''
''এই তো আছি বাবা এক রকম। আয় তোরা কাল.....'' যেন মিইয়ে গেল মায়ের গলার আওয়াজ।

সেটাই ছিলো সন্তানের সাথে মায়ের শেষ কথা। কারণ ততোক্ষণে পরপারের ডাক পড়ে গিয়েছে মায়ের। সবার অলক্ষ্যে বিদায়ের ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। আমরা কেউ টের পাইনি। মা নিজে কি টের পেয়েছিলেন? জানি না।

(১৩)

প্রত্যূষেই মা বিছানাতে ধড়মড় ক'রে উঠে বসার চেষ্টা করলেন। অস্ফুট স্বরে কঁকিয়ে উঠলেন, ''খেজুর, আমাকে ধর্। বাথরুমে নিয়ে চল্ মা।...আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি।...আলাহ্.....'' মায়ের বিছানার ঠিক পাশেই মেঝেতে 'খেজুর' নামের মেয়েটা শুয়ে ঘুমাতো। অল্প-বয়সে-বিধবা-হওয়া এই মেয়েটার কোনো পিছুটান ছিলো না। দীর্ঘকাল ধরে মনপ্রাণ ঢেলে আমাদের মায়ের সেবাযত্ন ক'রে আসছিলো।

মাকে আর বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়নি খেজুরের। দু'বছরের মাথায় তৃতীয় স্ট্রোকে তাঁর সমস্ত দেহ অবশ ও নিয়ন্ত্রণহীন হোয়ে গিয়েছিলো। দু'তিনবার 'আল্লাহ্- আল্লাহ্' শব্দ করার পর পর-ই অজ্ঞান হোয়ে গেলেন মা।

এরপরের ঘটনা খুব-ই গতানুগতিক। মাকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। সুজন যখন হাসপাতালে পৌঁছালো, তখন সবাই মৃত্যুর প্রহর গুণছিলো। নিথর দেহখানা নিয়ে মা শুয়ে ছিলেন। সেটাকে 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া' বলা চলে না। সবাই যেন বুঝেই নিয়েছিলো কী হতে যাচ্ছে। সুজন বিহ্বল, ভাষাহীন। এতদূর থেকে আসা কোলের মানিকটাকে মা আর চোখের দেখা দেখতে পেলেন না! বারো ঘন্টা অচেতন থাকার পর মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। সকল প্রতীক্ষার অবসান হলো। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দূঃখ আর হাসি-কান্নায় ভরা একটি মানব-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

(১৪)

বহুকাল আগে থেকেই জানতাম যে, মায়ের মৃত্যুর এই দিনটি 'একদিন' আসবেই। শুধু জানতাম না, সেটা কবে। আশা ছিলো, সুজনের পরিবারের সাথে মায়ের চমৎকার দু'টি মাস কেটে যাবে। মনে মনে হিসেব কষতাম, ওর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে আসার বেশ কিছু আগেই আমিও সপরিবারে পৌঁছে যাবো মা'র কাছে। আমাদের প্লেনের টিকেটও কাটা হোয়ে গিয়েছিলো। বড়ো ছেলের আবির্ভাবে হয়তো ছোটো ছেলের বিচ্ছেদ-ব্যথা তিনি কিছুটা হলেও ভুলে থাকবেন। তারপর একদিন আমারও বিদায় নেওয়ার সময় হবে। বিদায়বেলায় আমাদের সকলের বুক নিঃসন্দেহে ভেংগে যাবে। কারণ বিদায়ের দুঃখের কাছে মিলনের আনন্দ চিরকাল-ই ম্লান হোয়ে যায়। আমাদের বিদায়ের পর মা হয়তো খুব-ই ভেংগে পড়বেন। তারপর..., নাহ্ আর ভাবতে মন চাইতো না। শুধু ভাবতাম, পরেরটা পরেই দেখা যাবে। অর্থাৎ আমাদের আশানূসারে মা'র আরও কিছুদিন বাঁচার কথা ছিলো। ছেষট্টি বছর তো আর খুব বেশী বয়স নয়!

কিন্তু নিয়তি কি আর মানুষের হিসেব-নিকেষকে আমল দেয়! রূঢ় বাস্তবতা কি আর বিনীত কল্পনার ধার ধারে!! ঘটনা ঘটে তার নিজস্ব নিয়মে। ওভাবেই সব ঠিকঠাক করা থাকে কিনা! কালের গর্ভে এটা নির্ধারিতই হোয়ে ছিলো যে, মা পৃথিবীর বুক থেকে

চির-বিদায় নেবেন ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন সাড়ে চার ঘটিকায়। যখন তিনি মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিবেন, তখন নির্বাক তাঁর আদরের কনিষ্ঠ পুত্র তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশেই অবস্থান করবে, যদিও তিনি তা জানতে পারবেন না।

পূর্ব-নির্ধারিত হোয়েই ছিলো যে, ঢাকা-থেকে-রওনা-হওয়া মা'র সেজো ছেলে তাঁর মৃত্যুর পরে পৌঁছাবে। বড়ো আর মেজো- এই দুই ছেলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বসে তাদের মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাবে। বুক-ভাংগা রোদন তাদের জীবনযাত্রাকে ওলট-পালট ক'রে দিবে। আকাশ পাড়ি দিয়ে যখন তারা তাদের শোকাহত পরিবারসমেত অবশেষে ছেলেবেলার সেই 'ছায়ানীড়'-এ পৌঁছাবে, তখন তাদের স্নেহময়ী মা কবরের নিঝুম আঁধারে চির-নিদ্রায় শায়িত থাকবেন। দু'টি হাত বাড়িয়ে দিয়ে একবারও আর বলবেন না, ''বাবা, এতদিন পরে তোরা এলি?'' তারপর একদিন ধীরে ধীরে মায়ের নশ্বর দেহখানা মাটির সাথে মিশে যাবে। তাঁর নাকের ওপরের সেই ছোট্টো কালো তিলখানা আর হাসিখুশী চেহারাটা নিয়ে চিরকালের জন্য তিনি হারিয়ে যাবেন। এক সময় মা আমার শুধু ছবি হোয়ে রইবেন। তারপর একদিন তাঁর সন্তানেরা তাঁকে নিয়ে পত্রিকায় লিখবে.....
সবকিছুই পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিলো কিনা!!!

(১৫)

প্রত্যেক মা-ই অনন্য। কারণ তিনি যে মা! সন্তানের জন্য তাঁর বুকভরা যে ভালোবাসা, তার নেই কোনো দৈর্ঘ্য, নেই কোনো প্রস্থ– আছে শুধু এক অন্তবিহীন গভীরতা! সেই গভীরতা পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র কো-নো-দি-ন-ও আবিষ্কৃত হবে না।

মাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, ''বিধাতার কাছে আকুল প্রার্থণা করি, আমার মৃত্যুর আগে যেন আমায় দীর্ঘকাল যাবৎ শয্যাশায়ী হোয়ে রোগভোগ করতে না হয়।'' বিধাতা তাঁর সেই প্রার্থণা শুনেছিলেন। মা আরও বলতেন, ''বাবারে, জন্মেছি যখন, তখন তো মরতেই হবে একদিন। শুধু প্রার্থনা এই যে, সেই চরম ক্ষণটিতে যেন তোদের কোলে মাথা রেখে তোদের-ই অশ্রুসজল চোখের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৃত্যুর হিম-শীতল কোলে ঢলে পড়তে পারি!!!''

জগৎকর্তার পক্ষে মায়ের দ্বিতীয় প্রত্যাশাটি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি, তা আমরা, এই আধুনিক মানুষেরা, যারা মহাকালের পুচ্ছ ধরে জীবন-সংগ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, সবাই জানি।
কারণ বাস্তবতার সেই আদিম নিক্তিটি হাতে ধরেই মহাপ্রভূকে মানুষের ইচ্ছে পূরণ করতে হয় তো!

খন্দকার জাহিদ হাসান, ১৪/০১/২০০৭,
ইমেইল # zkhondke@bigpond.net.au

[পাদটীকাঃ আমার মায়ের নিজহাতে লাগানো গোলাপের ঝাড়টি সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর একটানা ফুল দেওয়ার পর গত অক্টোবর (২০০৬) মাসে অর্থাৎ মা মারা যাওয়ার মাত্র একমাস আগে অজ্ঞাত কোনো এক কারণে মরে যায়। পৃথিবীটা আসলেই একটা বিচিত্র জায়গা!]